দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নির্বাচিত হাসির কবিতা

আলোকিত মানুষ চাই

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নির্বাচিত হাসির কবিতা

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্ত নং:
পঠনপাঠনে: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
পৌষ ১৪০১ জানুয়ারি ১৯৯৫

ষষ্ঠ সংস্করণ অষ্টম মুদ্রণ
আষাঢ় ১৪১৮ জুন ২০১১

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
৯ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ইউসুফ হাসান

মূল্য
চল্লিশ টাকা

ISBN-984-18-0001-2

ভূমিকা

এক

রবীন্দ্র-প্রতিভার মতো অমন এক খরতর উজ্জ্বলতার মাঝে অবস্থান করেও মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনে (১৮৬৩-১৯১৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতার স্রষ্টারূপে যেভাবে আপন প্রতিভা-বলয় নির্মাণ করে গেছেন, তা স্মরণ করে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণে বাংলাসাহিত্যে তা বিচিত্র এবং অনন্য। রবীন্দ্রযুগের প্রায় পনেরো বছরকাল (১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত কাব্য 'আষাঢ়ে'র সময় থেকে) বাংলা সাহিত্যসমাজে 'ডি.এল.রায়' নামটি ছিল এক বিপুল আকর্ষণের বিষয়। সাহিত্যিক, স্বদেশী প্রেরণার নাট্যকার, সংগীতকার, ব্যঙ্গকৌতুক-প্রধান কবিতার জনক এবং বহু বিতর্কিত আলোচনা-সমালোচনার লেখক হিশেবে তিনি ছিলেন সমাদৃত।

এখানে 'রবীন্দ্রযুগ' সম্পর্কে দু-একটা কথা বলে নেয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককাল রবীন্দ্রনাথের আকাশস্পর্শী প্রতিভার দ্বারা যে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, তা আমরা আলো-অন্ধকারের মতো এখন স্পষ্ট দেখতে পেলেও এ-কথা বলা সম্ভব নয় যে রবীন্দ্রযুগ শুধু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই সম্পূর্ণ। স্বকীয় ক্ষমতায় বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক সে-যুগে আরও অনেকেই ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্বের কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০) থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর তিরিশ দশকের সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ প্রমুখ কবিরাই কেবল নন, ঔপন্যাসিক নাট্যকার ও মনস্বী প্রবন্ধকারেরও তখন অপ্রতুলতা ছিল না। তেমনি একজন ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বদেশি চেতনা একদিন বাঙালির জীবনে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, গান ও কবিতা ছিল সেই উজ্জীবনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কাব্যরীতি ও গানের বিচিত্র ধারা আজও একক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতি আজ কিংবদন্তির মতো। নাট্যকার হিশেবে তাঁর যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা একদিন ছিল, আজ তা হয়তো খানিকটা স্তিমিত। এর পেছনের কারণগুলোও আমাদের জানা। স্বদেশি আন্দোলনের সেই উদ্দাম জাতীয়তাবোধের উষ্ণ হাওয়া এখন আর নেই—যে সমকালীন প্রসঙ্গটি ছিল তাঁর

মঞ্চসফল জনপ্রিয় নাটকগুলোর মূল ভিত্তি। কিন্তু কবিতায় তিনি যে শক্তি ও মৌলিকতা নিয়ে এসেছিলেন, যে স্বতন্ত্র ও অভিনব ভঙ্গি—তার দীপ্তি ম্লান হবার নয়। আমরা মনে করি তাঁর কাব্যগুলোর প্রতি পাঠকসমাজের, রসিকসমাজের ও প্রকাশকগণের দৃষ্টি না-পড়াটা দ্বিজেন্দ্রলাল তথা বাংলাসাহিত্য দুয়েরই দুর্ভাগ্য।

দুই

১৮৬৩ সনের ১৯ জুলাই কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম। পিতা কার্তিকেয় চন্দ্র রায় ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। বারো বছর বয়স থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা ও গান রচনা আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাস করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলেতে যান। 'দি লিরিকস্ অব ইন্দ' নামে একটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ইংল্যান্ডে। এখানে তিনি বিশেষ করে আকৃষ্ট হন বিলেতি সংগীত ও রঙ্গমঞ্চের নাট্যাভিনয়ের প্রতি।

দেশে ফিরে ১৮৮৬ সনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে জীবন শুরু করেন। স্বাধীনচেতা স্বভাবের জন্য চাকরিজীবন তাঁর মোটেই সুখের হয়নি। ১৮৮৭ সনে বিয়ে করেন সুরবালা দেবীকে। ১৯০৫-এর দিকে তাঁর স্বাদেশিকতা ও আত্মমর্যাদাবোধের জন্য ক্রমাগত তাঁকে কেবলি বদলি করা হয়। আজীবন তিনি এমনিতেই স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগেছেন। এবার সেটাই তাঁকে পুরোদমে আক্রমণ করে। ব্যাধিজনিত অপারগতার জন্য তিনি ১৯১৩ সনের ২২ মার্চ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শেষজীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কিন্তু প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগেই ১৯১৩ সনের ১৭ মে সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘট।

'আর্যগাথা' (১৮৯৩) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ও গানের গ্রন্থ। এরপর 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯), 'হাসির গান' (১৯০০), 'মন্দ্র' (১৯০২), 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটকগুলোর মধ্যে 'সীতা', 'শাজাহান', 'মেবার পতন', 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'নূরজাহান' অন্যতম।

তিন

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা মূলত তাঁর 'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' গ্রন্থদ্বয় থেকে বাছাই করা কতকগুলো কবিতা ও গানের (যেগুলো এক-একটি স্বতন্ত্র কবিতা হিশেবেও অনন্য) সংকলন।

'আষাঢ়ে' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। এর কবিতাগুলো হাস্যরস-প্রধান। বাঙালি পাঠকেরা অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির বলেই বোধ করি বইটির প্রথম প্রকাশকালে লেখক নিজের নাম উল্লেখ করেননি। এই বইয়ের একটি কবিতার

নাম 'কর্ণবিমর্দন'। এই মর্দন ব্যাপারটি ওই বইয়ের প্রায় সব কবিতাতেই কিছু-না-কিছু আছে, তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায় ব্যাপারটি স্রেফ রস সৃষ্টির জন্যে তিনি আমদানি করেননি, বরং সামাজিক কপটতার যে-অংশেই তাঁর নজর পড়েছে সেখানেই তিনি ওই সহাস্য টিপ্পনীটি প্রয়োগ করে নিজের পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যমে তাঁর সমাজের মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন।

'হাসির গান' (১৯০০) প্রসঙ্গেও ওই একই কথা উল্লেখ করা চলে। তাঁর হাসি প্রাণবন্ত, উচ্চকণ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত, ইংরেজি 'humour'-এর পর্যায়েও ওঠে, আবার বাঙালিসুলভ ভাবপ্রবণতাও আছে তাতে। সকল রকমের অসংগতি ও ভণ্ডামি এসবের উপকরণ; ভণ্ডধর্মধ্বজীদের মতোই পেট্রিওটিজম-এর মিথ্যাচার। প্রেমের নামে মাত্রাহীন ভাবপ্রবণতা, অপদার্থতা প্রভৃতির শুধু মুখোশ খুলে দেয়নি, আপনাকে আপনি মনে করিয়েও দেয়—এইরূপই আমরা, আমাদেরও মুখে মুখোশ আছে। তিনি নিজের কাছেও তা গোপন করেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলে টের পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যাপারে কী পরিমাণ উৎসাহী ছিলেন :

"উত্তপ্ত লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে, তাঁহার ছন্দের প্রত্যেক ঝোঁকের মুখে তেমনি মিল বর্ষণ হইয়াছে। সেই মিলগুলি বন্দুকের ক্যাপের মতো আকস্মিক হাস্যোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ। ছন্দের কঠিনতাও যে কবিকে দমাইতে পারে না তাহারও অনেক উদাহরণ আছে। কবি নিজেই তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাগুলিকে নিয়মিত ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে স্থায়ী ও উপযুক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার 'বাঙালি মহিমা', 'ইংরেজ-স্তোত্র,' 'ডেপুটি কাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন' সর্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝক্‌ঝক করিতেছে।"...

"তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার জন্যে আসেন নাই, সেইসঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।"

আমরাও সেই আশ্বাসে প্রাণিত হয়ে 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নির্বাচিত হাসির কবিতা' গ্রন্থটি সহৃদয় পাঠকের হাতে অর্পণ করিলাম। আশা করছি এই গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর অন্তর্গত হাসি ও কান্না, কৌতুক ও কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শহিদুল আলম

সূচি

নন্দলাল ১১

১২ হতে পারতাম
১৩ আমি যদি পিঠে তোর ঐ
১৪ প্রণয়ের ইতিহাস
১৫ বেলাত ফের্তা
১৬ নতুন কিছু করো
১৭ বিলেত
১৯ কবি
২০ বুড়োবুড়ি
২০ বদলে গেল মতটা
২১ বসন্ত বর্ণনা
হোলো কী ২২
সুরা ২৩
পূর্ণিমা-মিলন ২৩
বেশ করেছ ২৪
যেমনটি চাই তেমন হয় না ২৬
কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ ২৭
তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ ২৮
সন্দেশ ৩০
খুসরোজ ৩০
নূতন চাই ৩১

নন্দলাল

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল—'আ-হা-হা কর কী, কর কী, নন্দলাল?'
নন্দ বলিল—'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!'

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা!
সকলে বলিল—'যাও না নন্দ, কর না ভা'য়ের সেবা!'
নন্দ বলিল—'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক';
তখন সকলে বলিল—'হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক!'

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ!—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোলা ও সন্দেশ থাল থাল;
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা নন্দলাল!'

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি;
নন্দ বলিল—'আ-হা-হা! কর কী, কর কী, ছাড় না ছাই,
কী হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই?
বলো ক'বিঘৎ দিব নাকে খৎ, যা বলো করিব তাহা';
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বাহা!'

নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি;
চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উল্‌টায় গাড়িখানি;
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—'ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল!'

হতে পারতাম

রাজা ॥ দেখ, হতে পারতাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির;
আর ঐ বারুদটারি গন্ধ কেমন করি না পছন্দ;
আর সঙিন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ;
খোলা তলোয়ার দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ;
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেই তো,—
তা নইলে খুব এক বড়—
পারিষদবর্গ ॥ হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।

রাজা ॥ দেখ, হতে পারতাম আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু 'গবেষণা' শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত;
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম,
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাঁকে চর্চা কল্লেও একটু কাজও দেবে বরং।
তাই স্ত্রীতত্ত্ববিৎ হয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেই তো,—
তা নইলে বেশ এক বড়—
পারিষদবর্গ ॥ হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।

রাজা ॥ দেখ, হতে পারতাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই;
আর ভাষাটাও, তাছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মারলেও দেয় নাকো সে সাড়া;

ছাই হাজারই পা দুলোই, গোঁফে হাজারই দেই চাড়া;
তাই নীরব কবি হয়ে রৈলাম আমি চটে' মটেই তো,—
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পারিষদবর্গ ॥ হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।

রাজা ॥ দেখ, হতে পারতাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্তত—
কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণশক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মতো;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলি হে;
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈঠকখানাবক্তা আমি চটে' মটেই তো,—
তা নইলে খুব ভারি—

পারিষদবর্গ ॥ হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।

রাজা ॥ দেখ, ক্ষমতাটা ছিল নাকো সামান্য বিশেষ;
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ।
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও সেও
ওই কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে একটা হতাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে নাকো কেহ,
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে' মটেই তো,
তা নৈলে—বুঝ্‌লে কিনা,—

পারিষদবর্গ ॥ হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে;
—তোর তো আস্পর্ধা বড়, পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে?
আমার পায়ে লাগল সেটা—কিছুই বুঝি নয়কো বেটা?
নিজের জ্বালায় নিজে মরিস্, নিজের কথাই ভাবিস্ আগে।
লাথি যদি না খাবি তো জন্মেছিলি কিসের জন্যে?
আমি যদি না মারি তো, মেরে সেটা যাবে অন্যে!

আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—ন্যাকামি নয়? শুয়োর গাধা!
—দেখ্‌ছি যে তোর পিঠের চামড়া ভ'রে গেছে জুতোর দাগে!
আমার সেটা অনুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি;—
লাথি যদি না মারতাম তো না মারতেও পারতাম না কি?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা! বরং রে তোর উচিত হাসা,
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত—আগে আমার পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া;
পরে ধীরে ধীরে নিজের পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া!
—পরে বলা ভক্তিভরে,—'প্রভু! অনুগ্রহ ক'রে
পৃষ্ঠে তো মেরেছ—লাথি মারো দেখি পুরোভাগে!
—দেখি সেটা কেমন লাগে!'

প্রণয়ের ইতিহাস

প্রথম যখন বিয়ে হল, ভাবলাম বাহা বাহা রে!
কী রকম যে হয়ে গেলাম, বলব তাহা কাহারে!
—ভাবলাম বাহা বাহা রে!
এমনি হল আমার স্বভাব, যেন বা খাঞ্জাখাঁ নবাব;
নেইকো আমার কোনোই অভাব; পোলাও কোর্মা কোপ্তা কাবাব,
রোচে নাকো আহারে;—ভাবলাম বাহা বাহা রে!
ভাবতাম গোলাপ ফুলের মতো ফুটে আছে প্রিয়ার মুখ,
দূরে থেকে দেখব শুধু, শুঁকব শুধু গন্ধটুক;
রাখ্‌ব জমা প্রেমের খাতায়, খরচ মোটে করব না তায়,
রাখব তারে মাথায় মাথায়, বুজব নাকো আঁখির পাতায়;—
হারাই পাছে তাহারে।—ভাবলাম বাহা বাহা রে!
শঙ্কা হত প্রিয়া পাছে কখন করে অভিমান,
উর্বশীর ন্যায় পেখম তুলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান;
নকলনবিশ প্রেমের পেশায়, হয়ে রৈতাম বিভোর নেশায়,
প্রাণের সঙ্গে দিয়ে কে সায়, খাম্বাজ সঙ্গে বেহাগ মেশায়;—
মরি মরি আহা রে!—ভাবলাম বাহা বাহা রে!
দেখলাম পরে চাঁদের করে নেহাইৎ প্রিয়া তৈরি নন,

বচন-সুধায় যায় না ক্ষুধা, বরং শেষে জ্বালাতন,
যদি একটু দাবা খেলায়, আসতে দেরি রাত্রির বেলায়,
অমনি তর্ক গুরু চেলায়, পালাই তাঁহার বকুনির ঠেলায়—
পগারে কি পাহাড়ে।—ভাবলাম বাহা বাহা রে!
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়,
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়;
বরং শেষে মাথার রতন নেপ্টে রইলেন আঠার মতন;
বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হতে হল পতন—
রচেছিলাম যাহারে।—ভাবলাম বাহা বাহা রে!

বিলাত ফের্তা

আমরা বিলেত ফের্তা ক-ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই;
তাই কী করি নাচার, স্বদেশি আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি,
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
আমরা চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা'—আর
মুটেদের ডাকি 'কুলি'।
'রাম' 'কালীপদ' 'হরিচরণ'
নাম এ-সব সেকেলে ধরন;
তাই নিজেদের 'ডে' 'রে' ও 'মিটার'
করিয়াছি নামকরণ;
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা মিস্টার নামে রটি
যদি 'সাহেব' না বলে 'বাবু' কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে

সেজেছি বিলিতি বাঁদর;
আমরা বিলিতি ধরনে হাসি,
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই,
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই,
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ, পরাই।
আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে, রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।
আমরা বিলেত ফের্তা ক-টায়,
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই;
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি;
স্পিচ দেই ইংরিজি খাঁটি;
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মতো
চম্পট পরিপাটি।

নতুন কিছু করো

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগ্‌বাজি খাও, ওড়ো;
কিংবা চিৎপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়া গাড়ি ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

ডাল ভাতের দফা করো সবাই রফা,
করো শিগগির ধুতিচাদরনিবারণী সভা;
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে;
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ ধরো;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

কিংবা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো;
হিন্দুধর্ম প্রচার কর্তে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাতই খাটো হয়ে না যাই, দেখো,—
খুব খানিক চেঁচাও কিংবা খুব খানিক লেখো;
বেন, মিল ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধরে মারো;
কিংবা তাঁদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো!
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক;
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব;
মরবে না হয় মারবে, একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিংবা নতুন রকম মরো;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

বিলেত

বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনার রুপার নয়;
তার আকাশেতে সূয্যি ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়;

তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর গাছেতে ফুল ফোটে;—
—তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা করছ নাকো মোটে;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বল্‌তে তাই।

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয় নাকো টিয়াপাখির ছা;
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা;
তাদের লেজগুলো সম্মুখে নয়, আর মাথাও নয়কো পিছে;
—তোমরা অবাক হচ্ছ, বোধ হয় ভাবছ এ-সব মিছে;
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি, এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ, আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে;
আর জোয়ান বুড়ো কচি, কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে।
তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে, পা-গুলো সব নিচে;
—তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয় ভাবচ এসব মিছে।
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি, এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

সেথা বসনভূষণ কমতি হলে স্বামীকে স্ত্রী বকে;
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, 'বাসি' হলেই টকে।
আর আমোদ হলে হাসে তারা দন্ত করে বাহির;
—তোমরা ভাবছ করছি আমি মিথ্যে কথা জাহির।
কিন্তু এসব সত্যি, এসব সত্যি, এসব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে তোমরাও বলতে তাই।

তবে কিনা, দেশটা বিলেত, এবং জাতটা বিলিতি;
কাজেই,—একটু সাহেবি রকম তাদের রীতি নীতি।
আর ঐ করে শুধু শাদা হাতে চুরি ডাকাতি সে;
আর স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে;—
এই তফাৎ, এই তফাৎ, এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ তফাৎ নাই।

কবি

আমি একটা উচ্চ কবি, এমনই ধারা উচ্চ—
শেলি, ভিক্টর, হিউগো, মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনোরূপে স্বর্গ থেকে ঢস্‌কে
পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাত ফস্‌কে!
(কোরাস)—মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ 'কুইলের' কলম হস্তে,
কে তুমি হে মহাপ্রভু?—নমস্তে নমস্তে!

আমি লিখছি যেসব কাব্য মানব জাতির জন্যে,
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝবে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজকালে যা সব লিখছি;
সেসব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখছি।
(কোরাস)—মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

আমার কাব্যের উপর আছে আমার অসীম ভক্তি;
আমি তো লিখছি না সেসব, লিখছেন বিশ্ব-শক্তি;
তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা—
পাবে গুরুদাসের নিকট ওজনদরে সস্তা।
(কোরাস)—মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

আমি নিশ্চয়ই এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব—
(যদিও তায় নেইকো বড় বেশি নূতনত্ব)
যে, ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ,
—আমি না বোঝালে তাহা কজন বুঝ্‌তে পারত?
(কোরাস)—মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম
তোমাদিগের মঙ্গল হউক, ভো ভো ভক্ত শিষ্য!
এখন করো গৃহে গমন নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাবব।
(কোরাস)—মর্ত্যভূমে—ইত্যাদি।

বুড়োবুড়ি

বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।
বুড়ি ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ো ছিল ভারি শাক্ত ॥
হত যখন ঝগড়াঝাঁটি, হত প্রায়ই লাঠালাঠি।
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত ॥
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' বলে, কোথা বুড়ো গেল চলে।
বুড়ি তখন বুড়োর জন্যে কর্লে চক্ষু লবণাক্ত ॥
শেষে বছরখানেক পরে বুড়ো ফিরে এল ঘরে।
বুড়ি তখন রেঁধেবেড়ে তাকে ভারি খুশি রাখত ॥
ঝগড়াঝাঁটি গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে,
বুড়ি দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গায়ে সাবান মাখত ॥

বদলে গেল মতটা

প্রথম যখন ছিলাম কোনো ধর্মে অনাসক্ত,
খ্রিস্টীয় এক নারীর প্রতি হলাম অনুরক্ত;
বিশ্বাস হল খ্রিস্টধর্মে—ভজতে যাচ্ছি খ্রিস্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে।
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,—
(কোরাস)—অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

চেয়ে দেখলাম—নব্যব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোঁজা ভিন্ন নাইকো অন্য কোনোই কষ্ট,—
কদাচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্মে,—
এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু form-এ
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,—
(কোরাস)—অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

নাস্তিকের এক দলের মধ্যে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে;
Hume ও Mill ও Herbert Spencer পড়তে লাগলাম সঙ্গে;
ভেসে যাব যাব হচ্চি Fowl ও Beef-এর বন্যায়,

এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গুটিকতক কন্যায়!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,—
(কোরাস)—অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Bain ও Mill-এর চর্চায়,
ছেড়ে দিলাম Beef, Fowl—অন্তত নিজের খর্চায়।
বুঝছি বসু ঘোষের কাছে হিন্দুধর্মের অর্থে,—
এমন সময় পড়ে গেলাম Theosophy-র গর্তে।
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,—
(কোরাস)—অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

সে ধর্মটার ঈশ্বর হচ্ছেন ভূত কি পরব্রহ্ম।
এইটে কর্ব কর্ব রকম কচ্চি বোধগম্য;
মিশিয়েও এনেছি প্রায় 'এনি' ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হয়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ!
—ছেড়ে দিলাম পথটা, বদলে গেল মতটা,—
(কোরাস)—অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

বসন্ত বর্ণনা

দেখ্ সখি দেখ্ চেয়ে দেখ্ বুঝি শিশির হইল অন্ত।
বুঝি বা এবার টেকা হবে ভার সখিরে এল বসন্ত।
বহিছে মলয় আকুলি বিকুলি, রাস্তায় তাই উড়ে যত ধূলি।
—এ সময় বিরহিণীগুলি কেমনে রবে জীবন্ত।

ঝর ঝর ঝর কুলু কুলু কুলু বহে ঘাম সব গাত্রে,
ভনভনে মাছি দিনের বেলায়, শনশনে মশা রাত্রে;
ডাকিছে কোকিল কুহু কহু কুহু গুঞ্জরে অলি মুহু মুহু মুহু
বাঁচিনে বাঁচিনে উহু উহু উহু হিহি হুহু হাহা হন্ত।

দেখ্ সখি দেখ্ বাজারেতে বুঝি ঘি দুধ হইল সস্তা
কিনে আন্ খেয়ে লঘু করে নিই বিরহের ভারী বস্তা।

স্মরণে যে ধারা বহে রসনায়, কী করি কী করি বাঁচা হল দায়
ভাঁড়ার ঘরটা আয় তবে আয় করে আসি লো তদন্ত।

পতি কাছে নাই, পতি বিনা আর কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আম দুটো পেড়ে আন্ সখি গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।
হেরি যে বিশ্ব শূন্যময়; নে খেয়ে নিয়েই শুই বিরহ শয়নে,
পড়ি গে অর্ধ-মুদিত-নয়নে গোলেব কাওলি গ্রন্থ।

নিয়ে আয় সখি বরফ—নহিলে মরি এ মলয় বাতাসে,
নিয়ে আয় পাখা—এল নাকো পতি আজ যে মাসের সাতাশে
নিয়ে আয় পান, তাস আন্ ছাই—বিরহের এত জ্বালা—মরে যাই।
দাঁড়াইয়ে কেন হাসিস লো ছাই বাহির করিয়ে দন্ত।

হোলো কী

হোলো কী! এ হোলো কী!—এ তো ভারি আশ্চর্যি!
বিলেত-ফের্তা টানছে হুক্কা, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চার্যি।
হোটেল-ফের্তা মুন্সেফ ডাকছেন 'মধুসূদন কংসারি'!
চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুরমতো সংসারী!

ছেলের দল সব চশমা পরে বসে আছে কাটখোট্টা;
সাহেবরা সব গেরুয়া পরছে, বাঙালি 'নেকটাই—হাটকোট্টা';
পক্ষীর মাংস, লক্ষ্মীর মতো, ছেলেবেলায় খাননি কে?
ভবনদীর পারে গিয়ে বিড়াল বসছেন আহ্নিকে।

পদ্য গদ্য লিখছে সবাই, কিনছে না কো কিন্তু কেই;
কাটছে বটে পোকায় কিন্তু, আলমারি কি সিন্দুকেই।
জহরচন্দ্র, গোকুলমাইতি বাড়ছে লম্বা চওড়াতে;
বিদ্যারত্ন দরকার শুদ্ধ বিয়ের মন্ত্র আওড়াতে।

পুরুষরা সব শুনছে বসে মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে।
গাচ্ছে এমনি তালকানা, যে শুনে তা পিলে চমকাচ্ছে।

রাজা হচ্ছে শিষ্টশান্ত, প্রজা হচ্ছে জবদ্দার;
মুনিব করছে 'আজ্ঞা হুজুর', চাকর করছেন 'খবদ্দার'।

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে;
ব্যাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম হরি ঘোষ আর প্রাণধন দে;
শাস্ত্রীবর্গ কোনোই শাস্ত্রের ধারেন না এক বর্ণ ধার,
স্ত্রীরা হচ্ছেন ভবার্ণবে বেশি মাত্রায় কর্ণধার।

সুরা

এ জীবনে ভাই একটুকু যদি বিমল আমোদ চাও রে—
তা'লে, মাঝে মাঝে—মাঝে, মন রে আমার, ঢুকু ঢুকু ঢুকু খাও রে।
এই, ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়, ঝরে সুরা পাকাবাড়ি;
আর, মজারূপ বারাণসীতে যাইতে—সুরাই রেলের গাড়ি রে;
এই, জীবনটা ঘোর মেঘলা এবং গৃহিণীটি ঘোর কালো;
এই, ভবরূপ ঘোর অন্ধকারে এ সুরাই একটু আলো রে।
আহা, হৃদিরূপ এই বাক্স খুলিতে সুরাই একটি চাবি;
আর, বোতল খুলিলে খুলিবে হৃদয়—তা অবশ্যম্ভাবী রে!—
কোনো, থাকিবে না ভেদ পাত্রাপাত্র, হিতাহিত বোধ—সেটা;
আর, শিকল ছিঁড়িয়া বেরিয়া পড়িবে কামক্রোধ দুই বেটারে।
তখন থাকিবে না কোনো চক্ষুলজ্জা, রবে না কারো ওয়াস্তা,
আর, হবে পরিষ্কার সুপ্রশস্ত চুলোয় যাবার রাস্তা রে!
এই, শোক পরিতাপ মাঝে যদি চাও সে মহানন্দ কিঞ্চিৎ,
তবে, মাঝে মাঝে মন কোরো রসনারে সুরাসুধারসে সিঞ্চিত, বাবা।

পূর্ণিমা-মিলন

এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
শুধু, আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এইখানেতে হয়ে জড়ো,

সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে করতে হবে কালহরণ।
হোক না ধনী, গরিব বড় ছোট সবার হেথা একাসন।
হেথায়, রবে নাকো ঐতিহাসিক গবেষণার কোনো ক্লেশ;
হেথায়, হবে নাকো বক্তৃতা কি যুক্তিশূন্য উপদেশ;
আমরা, আসিনিকো জারিজুরি করতে কোনো বাহাদুরি,
আমরা, আসিনিকো করতে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন।
হেথায়, নাইকো করতালির মধ্যে কারো আত্ম-নিবেদন।
যাঁদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি টান;
তাঁদের করতে হবে পরস্পরে প্রীতিদান ও প্রতিদান।
হেথায়, অনত্যুচ্চ কলরবে মেলামেশা করতে হবে,
—শুনুন, এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধরবেন না কেউ হল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।

বেশ করেছ

রাজা ॥ কালিচরণ করত বড় বীরত্বেরই বড়াই,
পারিষদবর্গ ॥ বুঝি গাঁজায় দিয়ে দম—
রাজা ॥ দেখলে সেদিন আমার সঙ্গে করতে এল লড়াই;
পারিষদবর্গ ॥ বেটার আস্পর্ধা নয় কম।
রাজা ॥ আমি বললাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি
তবে রে বেটা!
—পরে যখন ধরে আমায় করে দিল জুতোপেটা;
দেখলাম, বেটা আমার হাতে মরে বুঝি এবার
যোগাড় করেও তুলেছিলাম দুই এক ঘা দেবার।
বেটা তো সে খোঁজ রাখে না,
রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না,
কিন্তু রাগটা সামলে নিলাম অনেক কষ্টে সেবার।
পারিষদবর্গ ॥ বেশ করেছ, বেশ করেছ,
নহিলে অন্তত
একটা খুন খারাপি হত, একটা খুন খারাপি হত।
রাজা ॥ কেদার বেটা সাধু বলে শহরে ঢাক পেটায়,

পারিষদবর্গ ॥ হেঁ হেঁ বেটা আদত চোর।
রাজা ॥ নিইছিলাম তার হাজার টাকা
চাইতে এল সেটায়;
পারিষদবর্গ ॥ বেটা বোধ হয় গুলিখোর।
রাজা ॥ আমি বললাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি
তবে রে বেটা;
কে কে কে তোর টাকা জানে,
তো তো তো তোর সাক্ষী কেটা?
কর্ না গিয়ে মকর্দমা—I do not care a feather,
মুখখানি তো চুনটি করে ফিরে গেল কেদার।
টাকা নিয়ে করবে সে কী? টাকাগুলো সব শেষে কি
গাঁজা গুলি খেয়ে, বেটা উড়িয়ে দেবে দেদার?
পারিষদবর্গ ॥ বেশ করেছ, বেশ করেছ,
সে টাকা নিশ্চিত,
বেটা সব উড়িয়ে দিত, বেটা সব উড়িয়ে দিত।
রাজা ॥ নিত্যানন্দ, বিদ্বান বলে করতে চায় সে প্রমাণ;
পারিষদবর্গ ॥ সে কি আবার একটা লোক!
রাজা ॥ করতে এল তর্ক সেদিন আমার সঙ্গে সমান,
পারিষদবর্গ ॥ বেটা নিরেট আহাম্মক।
রাজা ॥ আমি বললাম তবে রে বেটা, আয় না দেখি
তবে রে বেটা,
আমি একটা philosopher, গাধা শুয়োর
জানিস্ সেটা,
বলে দু'ঘা পিঠে লাঠি বসিয়ে দিলাম চটাং,
লাঠি খেয়ে পড়ে গেল বেটা তো চিৎপটাং।
আমার সঙ্গে সে পারে কি,
তর্কের বেটা ধার ধারে কি,
তখন তর্কে হার মেনে সে পালিয়ে গেল সটাং।
পারিষদবর্গ ॥ বেশ করেছ, বেশ করেছ,
তর্কেতে বস্তুত
সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো, সেরা প্রমাণ
লাঠির গুঁতো।

যেমনটি চাই তেমন হয় না

দেখ গাঁজাখুরি এই ব্রহ্মার সৃষ্টি,
বিশৃঙ্খলা বিশ্বময়—না?
এই যখন চাই রৌদ্র ঠিক তখন হয় বৃষ্টি, আর
যখন চাই বৃষ্টি—তা হয় না।

আমি চাই অল্পমূল্যে হয় দামি পদার্থ,
চাই পাওনাদারগণ ভুলে স্বীয় স্বার্থ,
হেসে দিলেই হয় সব কৃত কৃতার্থ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে অগ্রগণ্যা;
অথচ সাত চড় মাল্লেও কথা কয় না;
চাই বেশির ভাগ পুত্র ও অল্পর ভাগ কন্যা;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই পুত্র-বিবাহে, আনে বয়স্থা—
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা,
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় সস্তা;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই চির-যৌবন, আমার কেমন যে বাতিক!
তা যৌবনটি বাঁধা তো রয় না;
চাই ধনে হই কুবের, আর রূপে হই কার্তিক;
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার বুদ্ধিটি হয় আরও সূক্ষ্ম
চাই ভার্যার মেজাজ হয় একটু কম রুক্ষ,
আমি চাই কেবল সুখটি আর চাই নাকো দুঃখ;—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই আমার গুণকীর্তন গায় বিশ্বসুদ্ধ;—
যেমন শিখানো টিয়া কি ময়না;

চাই ভস্ম হয় শত্রুগণ যখন হই ক্রুদ্ধ,
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

আমি চাই রেলে সাহেবগণ হন আরো শিষ্ট,
আপিসে মুনিবগণ কথা কন মিষ্ট,
আমি চাই অনেক জিনিস—কিন্তু হা অদৃষ্ট!—
তা যেমনটি চাই তেমন হয় না।

কৃষ্ণ-রাধিকা-সংবাদ

কৃষ্ণ বলে, 'আমার রাধে বদন তুলে চাও'
আর—রাধা বলে, 'কেন মিছে আমারে জ্বালাও—
মরি নিজের জ্বালায়'।

কৃষ্ণ বলে, 'রাধে দুটো প্রাণের কথা কই'
আর—রাধা বলে, 'এখন তাতে মোটেই রাজি নই—
সরো—ধোঁয়ায় মরি'।

কৃষ্ণ বলে, 'সবাই বলে আমার মোহন বেণু'
আর—রাধা বলে, 'ওহো—শুনে আমি মরে গেনু—
আমায় ধরো ধরো'!

কৃষ্ণ বলে, 'পীতধড়া বলে আমায় সবে'
আর—রাধা বলে, 'বটে! হল মোক্ষলাভটি তবে—
থাক্ আর খাওয়া দাওয়া'।

কৃষ্ণ বলে, 'আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো'
আর—রাধা বলে, 'তবু যদি না হতে মিশ্ কালো—
রূপ তো ছাপিয়ে পড়ে'!

কৃষ্ণ বলে, 'আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা'
আর—রাধা বলে, 'ঘুম হচ্ছে না! এ তো ভারি জ্বালা—
তাতে আমারি কী'!

কৃষ্ণ বলে, 'শুনি 'হরি' লোকে আমায় কয়'
আর—রাধা বলে, 'লোকের কথা কোরো না প্রত্যয়—
লোকে কী না বলে'!

কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার কী রূপেরই ছটা'
আর—রাধা বলে, 'হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা বটে—
সেটা সবাই বলে'।

কৃষ্ণ বলে, 'রাধে তোমার কিবা চারু কেশ'
আর—রাধা বলে, 'কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—
সেটা বলতেই হবে'।

কৃষ্ণ বলে, 'রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা—'
আর—রাধা বলে, 'কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—
যেন সুধা ঝরে'।

কৃষ্ণ বলে, 'এমন বর্ণ দেখিনি তো কভু'
আর—রাধা বলে, 'হাঁ আজ সাবান মাখিনি তো তবু—
নইলে আরও সাদা'।

কৃষ্ণ বলে, 'তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে'
আর—রাধা বলে, 'এসব কথা বল্লেই হত আগে—
গোল তো মিটেই যেত'।

তান্‌সান্‌-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নব রত্ন ন' ভাই;
আর, তান্‌সান্‌ ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাঁহার সভায়;
অ—অর্থাৎ আস্‌তেন নিশ্চয় তান্‌সান্‌ বিক্রমাদিত্যের 'কোর্টে'—
কিন্তু, দুঃখের বিষয় তখন তান্‌সান্‌ জন্মাননিকো মোটে।

(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক, এলেন তান্‌সান্‌ কলিকাতায় চড়ে রেলের গাড়ি;
আর, 'হুগলি' ব্রিজ পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি;
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু 'রেল পুল' তখন হয়নি;
আর, বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক, এলেন তান্‌সান্‌ রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি;
আর, নিয়ে এলেন নানা বাদ্য—'পিয়ানো' ইত্যাদি;—
অ—অর্থাৎ আন্‌তেন নিশ্চয়, কিন্তু হল হঠাৎ দৃষ্টি।
যে হয়নিকো তান্‌সানের সময় 'পিয়ানো'রও সৃষ্টি।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

যাহোক, তান্‌সান্‌ গাইলেন এমন মল্লার, রাজা গেলেন ভিজে;
আর, গাইলেন এমন দীপক, তান্‌সান্‌ জ্বলে উঠলেন নিজে;
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে তান্‌সান্‌ উঠলেন জ্বলে;
কিন্তু, রাজার ছিল 'ওয়াটার প্রুফ', আর তান্‌সান্‌ এলেন চলে।
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

হল সেই দিন থেকে প্রসিদ্ধ তান্‌সানের গীতি বাদ্য;
আর, আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ;
অ—অর্থাৎ, তাঁর গানের শ্রাদ্ধ—তাঁর তো হয়ে গেছে কবে?
আর তান্‌সান্‌ মুসলমান, তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন করে হবে?
(কোরাস) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি
ধিন্‌তাকি,—মেও এঁও এঁও।

সন্দেশ

আহা সন্দেশ বুঁদে গজা মতিচুর সরভাজা সরপুরিয়া;
উঁহুঁ, গড়েছ কী নিধি, দয়াময় বিধি, কত না বুদ্ধি করিয়া
যদি দাও তাহা খালি—আহ্! মদীয় বদনে ঢালিয়া;
উঁহুঁ, কোথায় লাগে বা কোর্মা কাবাব, কোথায় পোলাও কালিয়া;
উঁহুঁ, খাই তাহা হলে চক্ষু মুদিয়া, চিৎ হইয়া, না নড়িয়া।
আহা, ক্ষীর হত যদি ভারত জলধি, ছানা হত যদি হিমালয়,
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু সুবিধা হয়তো মহাশয়;

অথবা দেখিয়া শুনিয়া বেড়াতাম গুনগুনিয়া,
আহা, ময়রা দোকানে মাছি হয়ে যদি—কী মজারি হত দুনিয়া;
আহা, বেজায় বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে 'মরিয়া'।
ওহো, না রাখিত বাঁধি' সন্দেশ আদি, সংসারে এই সমুদয়,
ওহো, হয়ে মুনি ঋষি, ছুটে কোন্ দিশি, যেতাম হয়তো মহাশয়!
পেলাম না শুধু—হরি হে!—খাইতে হৃদয় ভরিয়ে;
ওহো, না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে;
ওহো, মনের বাসনা মনে রয়ে যায়, চোখে বহে যায় দরিয়া।

খুসরোজ

আজি, এই শুভদিনে শুভক্ষণে উড়ায়ে দিই
জয়-ধ্বজায়,
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা তো হবে বজায়;
—আমাদের ভক্তি যা এ—এযে গো মানের দায়ে;
এখন তো উচিত কার্য এদিক ওদিক বুঝে চলাই;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

আজি, এই শুভ-রাত্রি, জ্বালব বাতি ঘরে ঘরে
ভক্তিভাবে;
নৈলে যে চাকরি যাবে, নৈলে যে চাকরি যাবে।

—আমাদের ভক্তি যা এ—এযে গো পেটের দায়ে;
নিয়ে আয় চেরাক বাতি, নিয়ে আয় দিয়েশেলাই;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

'জয় জয়, বৃটিশ ব্যাঘ্র বৃটিশ ব্যাঘ্র' ব'লে জোরে
ডঙ্কা বাজাই;
পাহারা ফিরছে দ্বারে, সেটা যেন ভুলে না যাই;
—আমাদের ভক্তি যা এ—এযে গো প্রাণের দায়ে;
কী জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায়;
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

আমরা সব 'রাজভক্ত রাজভক্ত' বলে চেঁচাই উচ্চ রবে;
কারণ সেটার যতই অভাব, ততই সেটা বলতে হবে;
—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে;
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায়;
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

ভোলানাথ শুয়ে আছে,—ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন;
কালী জিভ মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন;
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটেই আঁকা;
আমরা সব নিয়েছি শরণ বৃটিশদেবের চরণতলায়;
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

নূতন চাই

পুরানো হোক, ভালো হাজার,
হায় গো, এমনি কলির বাজার,
মাঝে মাঝে নূতন নূতন নৈলে কারো চলে না;
নিত্যই পোলাও কোর্মা আহার
বল ভালো লাগে কাহার?
আমার তো তা দুদিন পরে গলা দিয়ে গলে না।

দু-চার বর্ষ হলে অতীত,
চাষার জমি রাখে পতিত
নইলে সে—উর্বরা হলেও বেশিদিন আর ফলে না;
নিত্যই যদি কার্য না পাই,
প্রাণটা করে হাঁফাই হাঁফাই;
যদিও ঘুমিয়ে থাকলেও কেউই কিছুই বলে না।
ক্রমাগত টপ্পা খেয়াল,
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল;
প্রত্যহ অপ্সরা দেখলে তাতে আর মন টলে না;
এক স্ত্রী নিয়ে হলে কারবার,
ঝালিয়ে নিতে হয় দু-চারবার
বিরহ আহুতি ভিন্ন প্রেমের আগুন জ্বলে না।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন
দেশ ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র